প্রবন্ধ

সুখ

দেবরাজ সেনগুপ্ত, এফ ই ৩৭৪

'সুখ' এই দুই অক্ষরের শব্দটির জীব জগতে বিশেষ করে মানব জীবনে অপরিসীম গুরুত্ব আছে, শব্দটির ব্যাখ্যা করলে (অভিধানগত অর্থ) যা মানুষ ও অপরাপর জীবকে মানসিক ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দৈহিক আনন্দ বা তৃপ্তি প্রদান করে (প্রাপ্তি ও অনুভূতির মাধ্যমে) এবং যা না থাকলে মানুষ কষ্ট পায়।

এখন 'সুখ' এর এই সংজ্ঞা থেকে কি প্রকৃত সুখের বিশ্লেষণ করা সম্ভব ?

Happiness is always a relative term which simply can't be defined or described without any perspective or circumstances and in most cases it remains elusive or a wild dream, হ্যাঁ 'সুখ' শুধুমাত্র অবস্থার উপর নির্ভর করে অনুভূতি সব সময় নয় তবে অবস্থা যদি সমীচীনও হয় অর্থাৎ favourable situation যেখানে যা পার্থিব ভোগের উপকরণ অর্থাৎ বাড়ী, গাড়ী, ধনসম্পত্তি, অর্থ এবং নারী (অনেকের চোখে) প্রেম ভালোবাসা ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে জৈবিক চাহিদা যা hedonistic or non romantic তা কি সুখ প্রদান করতে পারে ? এর উত্তর 'না'।

পার্থিব বস্তু বা articles to fulfil materialistic pleasure কখনো সুখের উৎস হতে পারে না। ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত অনুসারে যাঁরা বিশ্ববন্দিত চিন্তানায়ক এবং জন-হিতকর কর্মে আত্ম নিয়োগ করেছেন। তারা প্রকৃত সুখের অর্থ ও উৎস খুঁজে বেড়িয়েছেন, যেমন Socrates, Plato, Lao Tse, Confucious, Hammurabbi, গৌতম বুদ্ধ, হজরত মহম্মদ, জরথস্ট্র, Moses, যিশুখ্রীষ্ট থেকে শুরু করে মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের অনেক বিশ্বখ্যাত মহামনীষী (এঁদের মধ্যে বহু ভারতীয়ও আছেন) যাঁরা 'সুখ' শব্দটিকে ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজ নিজ ভঙ্গীতে interprete করেছেন।

সেই সমস্ত বিশ্লেষণ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী বা contradictory or paradoxical হয়েছে।

তাহলে কি 'সুখ' মরুভূমির মরীচিকা মাত্র ? মানুষ কি শুধু কষ্ট পেতেই এ পৃথিবীতে এসেছে ? ''নাই কিরে সুখ, নাই কিরে সুখ এ ধরা কি শুধু বিষাদময়, যাতনে জ্বালিয়ে কাদিয়া মরিতে শুধু কি মানব জন্ম লয় '' (কামিনী রায়) 'না'- তা নয়, কারণ নিজের কর্মের মাধ্যমে ও যে অবস্থায় থাকে মানুষ তা যদি নিজে খুশী মনে মেনে নিতে পারে তাহলেই সে সুখী হয়।

মহাভারতে উল্লেখ করা আছে যুধিষ্ঠির কে যখন যক্ষ প্রশ্ন করেছিলেন ''কে প্রকৃত সুখী ?'' যুধিষ্ঠির জবাব দিয়েছিলেন ''যে সমস্তদিন আপন কর্ম করে সন্তুষ্ট হয়ে দিনের শেষে শাকভাত খায় সেই সুখী।'' কয়েক বছর আগে ISCE Board এর ইংরাজী সাহিত্যের পাঠ্যক্রমে একটা ছোট গল্প ছিল যা আমি আমার প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীদের পড়িয়ে ছিলাম গল্পটির নাম 'Happiness' সেখানে এক কিশোর কিশোরী তাদের বাবা মা ও পরিবারের অন্য সব সদস্যদের কথা না মেনে পালিয়ে গিয়ে ছিল শুধু মাত্র প্রেমের তাগিদে 'teenage love and subsequent elopement' ও বলতে পারেন। তাদের আর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

বহু বছর পরে একটি জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপে বসবাসকারী এক প্রৌঢ় দম্পতির কাছে গিয়ে একজন সাংবাদিক এই রহস্য

ভেদ করেন যে ওই স্বামী স্ত্রীই সেই কিশোর কিশোরী এবং এক প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলেন, 'We have found real happiness here and we don't seek or hanker for more' এর থেকে প্রমাণ হয় যে তাঁরা অনেক কষ্ট ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও সে সব কে বাধা বলে মানেন নি এবং they have taken every adverse situation in their stride to uphold their love.

তাই 'সুখ' শুধুমাত্র পার্থিব ভোগ বা materialistic pleasure এর উপকরণ হিসাবে পরিগণিত হয় না it is not to be taken only as something which we aquire through all material elements of pleasure বরঞ্চ ওই সব থাকলে দুঃখ ও উদ্বেগের মাত্রা বেড়ে যায়। ''যার ভান্ডারে রাশি রাশি সোনাদানা ঠাসাঠাসি তারো ভয় জেনো সেও সুখী নয়।"(সত্যজিত রায়)

সুতরাং ''নাল্পে সুখ মস্তি ভূমৈব সুখম" সুখ অর্জণ করার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা বস্তুবাদ ত্যাগ করে ভাববাদে উত্তরণ ও পরহিত ব্রতে জীবন উৎসর্গ করা। শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ ঠিক এই কথাই বহুবার বলে গেছেন। তাই প্রকৃত সুখের উৎসই হল অপরাপর মানুষ ও জীব জন্তুর হিতসাধন করা।

If you search for your own happiness
in material elements
you will find nothing
real happiness will always
remain elusive till you
create through your efforts
a situation (in a selfless manner)
in which every
living being be it mankind
or other animals are really
and truly benifitted then
you yourself shall really and truely
be happy. We all are for others.
Fellow feeling needs to be the key word here
and is the source of perennial happiness.

আবারো যাই কামিনী রায়ের সেই বিখ্যাত কবিতায় যেখানে তিনি বলেছেন,

''আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসি নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে"

যদি ব্যক্তি স্বার্থদ্বারা পরিচালিত না হয়ে সমাজ, দেশ বা সংঘবদ্ধ জনগণের হিতসাধনে আত্মনিয়োগ করা হয় তাহলেই প্রকৃত সুখ লাভ সম্ভব না হলে ''নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস" তাই হবে।

''সুখ যদি পেতে চাও
অপরকে সুখ দাও" (নিজের কথা না ভেবে)

এই দুছত্রের কবিতার মাধ্যমেই অলমতি বিস্তরেণ।

"ক্ষমতার মদ অত্যন্ত কড়া, সেলামের মোহ মজ্জার মধ্যে জড়িত হইয়া যায় এবং প্রেস্টিজের অভিমান ধর্মের কাছেও মাথা হেঁট করিতে চায় না''

— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রবন্ধ

নেতাজীর ভারত স্বপ্নের কিছু কথা

তারাপদ কর, এফ ই-১৮

২০২৩ এর ২৩শে জানুয়ারীতে যখন নেতাজীর জন্ম কথা টিভির পর্দায় বিভিন্ন ভাবে (তার জন্ম, স্বাধীনতা বিষয়ক সংগ্রামের) আলোচনা হচ্ছিল তখন আমার ইচ্ছা হচ্ছিল যে তার খানিকটা কাহিনীর উল্লেখ করি- বিশেষভাবে মনিপুর রাজ্যের ইম্ফলের কিছু কিছু জিনিস আমি আলোচনা করি। নিজস্ব পেশাগত কাজের জন্য ওখানে কয়েক দিন ছিলাম। এটা সকলেই স্বীকার করেন যে সুভাষচন্দ্র আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে এখানে একটা অনুপম ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসকদের উপর সশস্ত্র আঘাত হেনেছিলেন।

তার আজাদ হিন্দ বাহিনী দেশের ভিতর প্রায় দেড়শো মাইল ঢুকে এসেছিল, কোহিমার ময়রাঙে সগৌরবে উড়িয়েছিলেন জাতীয় পতাকা। তারপর অবশ্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় একেবারে ঘুয়ে যাওয়ায় তার বাহিনীকে একটু পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। আত্মসমর্পন করতে হয়েছিল ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির কাছে।

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি হরিপুরা- ভাষণে (১৯৩৮) জাতীয় ঐক্য, গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক পুরগঠন ইত্যাদির মাধ্যমে এক নতুন ভারত গড়ার কথাও বলেছিলেন।

হরিপুরা ভাষণে তিনি জন্ম নিয়ন্ত্রনের কথা বলেছিলেন। সেই সঙ্গে দারিদ্র দূরীকরনের কথাও। সমবায় ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে এবং কৃষিকাজকেও করতে হবে বিজ্ঞান ভিত্তিক। আরও বিশেষ করে শিল্পায়ন। তিনি চেয়েছিলেন একটা পুর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় শিল্পায়ন। তারজন্য তিনি একটা "প্ল্যানিং কমিশন" গঠনের উপরেও জোর দিয়েছিলেন।

১৯৪৩ সালে সিঙ্গাপুরে একটি সভায় সুভাষচন্দ্রের এক আবেগ মথিত বক্তৃতার স্মৃতিচারণ করেছেন নেতাজীর ছায়াসঙ্গী শাহনওয়াজ খান। সেদিন বক্তৃতা শেষ করে নেতাজী সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ছিলেন। হাজার হাজার লোক এগিয়ে এলো সাহায্য করতে। সারা দিয়ে যারা আসছিলেন তাদের অধিকাংশই প্রচুর টাকা দিচ্ছিলেন। সহসা শাহনওয়াজ দেখলেন — স্টেজে উঠে পড়েছেন একজন বৃদ্ধা শ্রমিক রমণী দান করার ইচ্ছায়। হতদরিদ্র চেহারা — ছেঁড়া কাপড় – মাথায় টানার মতোও সে কাপড় নয়। তার আঁচল থেকে তিনটি টাকা বার করে তিনি নেতাজীকে দিলেন। নেতাজী ইতস্তত করছেন— বৃদ্ধা বললেন — ''দয়া করে এগুলি নিন — এর বেশী আমার আর কিছু নেই দেবার মতো — এই আমার সর্বস্ব।" নেতাজী তখনও ইতস্তত করছিলেন। তারপর দেখা গেলো — বড় বড় জলের ফোঁটা তার চোখ দিয়ে পড়ছে। তখন টাকাগুলি নেবার জন্য নেতাজী হাত বাড়ালেন।

সভার পরে শাহনওয়াজ খান জিজ্ঞেস করেন — ''ঐ টাকা নিতে ইতস্তত করছিলেন কেন আর আপনার চোখেও কেন জল?"

সুভাষচন্দ্রও সেই ছলছল চোখে বললেন— ''সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন হচ্ছিল। দরিদ্র বৃদ্ধার দিকে তাকিয়েই বুঝ লাম ওই টাকা গুলোই তাঁর সম্বল। এইগুলি নিয়ে নিলে ভয়ানক দুর্দশায় পড়বেন ওই দিদি।
তারপর ভাবলাম — আহা কী মন ওনার — উনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব দিতে এসেছেন। যদি তা না নিই, তবে ওঁকে ব্যথা দেওয়া হবে। হয়ত ভাববেন, টাকা অল্প বলেই আমি নিলাম না। তাঁর কাছ থেকে যা নিলাম —আমার কাছে ওই তিনটি টাকার মূল্য ধনীদের দেওয়া লক্ষ লক্ষ

টাকার চেয়ে অনেক বেশী। ওই তিন টাকার মূল্যায়ন করা খুব কঠিন।"

পরে নেতাজীর নেতৃত্বে যখন প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট তৈরী হয়, তখন তিনি আন্দামানের সেলুলার জেলে এসে হাজার হাজার দেশ প্রেমিক বন্দীদের মুক্ত করেছিলেন। নেতাজী আসার পর সেলুলার জেলে আর কোন ফাঁসি হয়নি। আর এই সময়েই ১৯৪৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তিনদিন পর সবাই মুক্ত হয়ে যান। আর এই সময়েই ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে ছিলেন, হেঁকে ছিলেন — 'স্বাধীন ভারত তাঁর স্বপ্নের ভারত।'

আমিও তাই উপলব্ধি করি —
'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।'
উপসংহারে আমার স্বরচিত কবিতার মাধ্যমে সবাইকে জানাই ভালোবাসা ও প্রনাম—

ভারত আমার সাধন ক্ষেত্র ভারতই আমার দেশ
ভারতই আমার মা-জননী ভারতই আমার শেষ।
সেলাম জানাই তেরঙ্গা পতাকায়, সেলাম জানাই শহীদে
তাদেরই ত্যাগে মুক্ত আমরা তাদেরই মুর্তি ধরিনু হৃদে
স্মরণে রাখি তাদের কীর্তি, জপিনু মালা দিনভর
ফিরিনু তাই নিজের কর্মে স্মরিয়া তাদের কণ্ঠস্বর।

" আমরা সবাই জানি — অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী। কিন্তু কেন ভয়ংকরী তা জানি না। মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান বাড়িয়ে চলার সাধনায় চিরদিন সবচেয়ে বাধা হয়ে থেকেছে আমিত্বের অহংকার। আমি যেটুকু জানি সেটা জানাই যথেষ্ট — এই অহংকার। ''

— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধ

শতবর্ষে আবোল তাবোল

ডঃ মহুয়া ভট্টাচার্য, এফ-ই-১৪৮

'আবোল তাবোল' শব্দটা শুনলেই কি মনে হয় বে-ঠিক, বে-চাল, উল্টোপাল্টা, ভুলভাল বক্তব্যেরই কি আরেক নাম 'আবোল তাবোল'? এটাই তো আমাদের প্রচলিত, চিরাচরিত ধারণা। কিন্তু পরিস্থিতির বিচারে, ব্যবহারের কৌশলে অনেক বাক্য, অনেক শব্দের যে বহুমাত্রিক স্বর উঠে আসে, ভিন্নমাত্রিক প্রয়োজনে যে তার উপযোগিতা বোঝা যায় সে-ও তো সত্যি। ঠিক সেই ভাবেই বিশিষ্ট কৃতী, মেধাবী, বিজ্ঞানমনস্ক, চিন্তাশীল, পরিণত-বয়স্ক লেখক সুকুমার রায় (১৮৮৭ - ১৯২৩) যখন একটা গ্রন্থের নামকরণ করেন 'আবোল তাবোল' (১৯২৩), নাম কবিতায় ও শেষ কবিতায় তুলে আনেন এমন গ্রন্থ রচনার কৈফিয়ৎ —তখন আর সেই অর্থ একমাত্রিক, সাদা-মাটা, নিছক ভুল বকার দলিল হয়ে থাকে না। বাস্তব-অবাস্তবের মিশ্রণে সুকুমারের একান্ত নিজস্ব 'ননসেন্স'র জগৎ ধরা পড়ে। অসম্ভব, অসঙ্গত শব্দের দ্যোতনায় ঔপনিবেশিক ভারতের কোন্ সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও সমালোচনা করতে চেয়েছেন সেটাই এই রচনার উদ্দেশ্য ও বিধেয়। 'আবোল তাবোল' প্রকাশনার শততমবর্ষে তাই ফিরে দেখা যাক সুকুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

স্বনামধন্য উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সুযোগ্য সন্তান সুকুমার ১৯০৬ -এ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে জোড়া অনার্স সহ বিএসসি পাস করে গুরু প্রসন্ন ঘোষ বৃত্তি লাভ করে ম্যানচেস্টারের স্কুল অফ টেকনোলজি থেকে হাফটোন প্রিন্টিং এবং ইংল্যান্ডের LCC School of Photo Engraving and Lithography তে FRPS ডিগ্রী লাভ করেন ১৯১৩-য়। বিলেতে থাকা কালীন Royal Photographic Society র ফেলো নির্বাচিত হন। তার আগে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন ও হাসির গান লিখে জনসংযোগ স্থাপন করেন। এহেন কৃত্যবিদ যখন অসংখ্য চিন্তাশীল বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ গল্প কবিতা ছড়া নাটক লেখার পাশাপাশি ১৯০৭-এ ননসেন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন ও ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের বক্তৃতায় বলেন, যে কথা তিনি বলতে যাচ্ছেন তার একটা কথাও তিনি বিশ্বাস করেন না — আশার কথা, আনন্দের কথা, optimism -র কথা এক বর্ণও বিশ্বাস করেন না। যা বিশ্বাস করেন তা ঠিক উল্টো—"rampant, morbid,out and out pessimism ...এই যুগের মানুষের মন থেকে আশার প্রদীপ নিভে গিয়েছে। মানুষের আনন্দের উৎস মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কেউ আশা করতে জানে না, কেউ ভবিষ্যতের কিছু ভরসা রাখে না — কি অদ্ভুত strange depressing experience... অনেক অনেক cherished illusions সব ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে।" এরপরই তিনি বলেন আর অপেক্ষা করে থাকবার সময় নেই। যা করতে হয় এখনই কৃত সংকল্প হতে হবে। সেই কাজের একটা নিশ্চয়ই ছিল — লেখা। নিজের কাছে দেওয়া এই জবানবন্দির কয়েকদিন পরেই 'সন্দেশ'-এ বেরোবে শব্দকল্পদ্রুম, বাবুরাম সাপুড়ে, ট্যাঁশগরু, সাধে কি বলে গাধা, একুশে আইন, বোম্বাগড়ের রাজা, অবাক কান্ড, ভালো-রে-ভালো, পালোয়ান, জালা-কুঁজো সংবাদ, নাচের বাতিকের মতো কবিতা। দাশুর খ্যাপামি, সবজান্তা দাদা, উকিলের বুদ্ধি, হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরির মত গল্প। ১৩২৯ এ ধারাবাহিকভাবে হ য ব র ল, এবং লেখা হবে আবোল তাবোল এর শেষ কবিতাটি যেখানে স্পষ্ট শোনা যায় তাঁর বিদায় বার্তা। মৃত্যু চেতনার বিষাদময় স্বর। সত্যজিৎ রায় এ প্রসঙ্গে এক ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন হয়তো এতদিনের অভ্যাস ও বিশ্বাসের পাথর ঠেলে বাইরে আসার পরিশ্রম ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকেই দেহে মনে ভেঙ্গে গিয়েছিলেন তিনি। তাই প্রাজ্ঞ সুকুমার রচিত 'আবোল তাবোল' খেয়াল-খুশির পাগলামি

নয়, সমস্ত illogicality -র মধ্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে প্রবেশ করলে তবেই তার যথাবিহিত মর্মোদ্ধার করা যায়।

আবোল তাবোল গ্রন্থের কবিতায় একে একে হাজির হয় আজব সব চরিত্র। যারা আকারে প্রকারে বিচিত্র হলেও উদ্ভট তত্ত্বে বিশ্বাসী এবং উৎকট বাতিকগ্রস্তত ার কারণে এক সূত্রে বাঁধা। এদের এক সাধারণ ধর্ম — এদের প্রত্যেকের মনে আফশোষ, কেউ এদের কথা বোঝে না, শোনে না। তারা যতই অচেনা জগতকে সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করুক না কেন শেষ পর্যন্ত প্রাপক নিরুৎসাহই হয়ে থাকে। তা সে 'রোদে রাঙা ইঁটের পাঁজা'য় বসা রাজার কথাই হোক বা 'হেড অফিসের বড়বাবু'। ছায়াবাজির ব্যবসাদার, ফুটোস্কোপের আবিষ্কর্তা, চন্ডীদাসের খুড়ো, হাতুড়ে ডাক্তার, কাষ্ঠতত্ত্ববিদ কাঠ বুড়ো বা 'বুঝিয়ে বলা'র তত্ত্ব জ্ঞানী — কারোরই অযাচিত পরামর্শে কান দেয় না কেউই। তাই এরা কখনো রেগে যায়, কখনো কেঁদে ফেলে, কখনো দুঃখ পায়, কখনো বা বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে —

''মানবে না কোন কথা চলাফেরা আহারে,
একদিন টের পাবে ঠেলা কয় কাহারে।''

কাঠবুড়ো ''রেগে বলে, 'কেবা বোঝে এসবের মর্ম?
আরে মোলো গাধাগুলো একেবারে অন্ধ
বোঝে নাকো কোন কিছু খালি করে দ্বন্দ্ব'।''

এইভাবে ''তুচ্ছ ভেবে এসব কথা করছে যারা হেলা,
কুমড়ো পটাশ জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।''

বোম্বাগড়ের রাজা তাই বলে ওঠেন —

''এমন কেন ঘটছে তা কেউ বলতে পার মোরে?''

কোনমতে হাল না ছেড়ে বুঝিয়ে বলা-র তত্ত্বজ্ঞানী শ্রোতাকে গলায় চাদর দিয়ে ধরে বলে —

''আজকে তোকে সেই কথাটা বোঝাবই বোঝাব
না বুঝি তো মগজে তোর গজাল মেরে গোঁজাবো।

তত্ত্বকথা যায় না কানে যতই মরি চেঁচিয়ে
ইচ্ছে করে ডানপিটেদের কান ম'লেদি পেঁচিয়ে।''

এমন উদাহরণ আরো অনেক আছে। লেখক নিজেও সখেদে বলেছেন, 'আবোল তাবোল' বোঝা সবার কর্ম নয়, উদ্ভটরসের ভোক্তা সবাই হতে পারে না। নিরুপায় নিঃসঙ্গ জ্ঞানীরা তাই আজ কোণঠাসা, তাদের মহামূল্য কথাকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। যারা একান্ত অজ্ঞান ও অবোধ, বেপথুমান তারা কেবল কানচাপা দিয়েই থাকে। স্বভাবতই জানতে ইচ্ছে করে কি এমন সেই কথা যা সহজে কেউ বোঝে না, অথচ যার বহিরঙ্গ চিরন্তন সার্থক এক শিশু পাঠের তাক লাগানো মোড়কে আবৃত! কেনই বা তিনি অদ্ভুত সন্ধির নিয়মে হাঁসজারু, বকচ্ছপ, মোরগরু, গিরগিটিয়া, সিংহরিণ, হাতিমিদের সৃষ্টি করেন। তাঁর আঁকা ছবিতেও স্পষ্ট হয় উদ্ভট প্রাণীদের চেহারা। চতুর্দিকে 'বিদ্যেবোছাই বাবুমশাই'দের ছড়াছড়ি অথচ নিজেদের জীবন বাঁচানোর সাধারণ বাস্তব বুদ্ধিটুকুও এদের নেই। এদের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দিলেই এরা ভীষণ রেগে ওঠে। এদের মগজের নানা কোণে ঘুরে চলে, দুরূহ ধাঁধার প্রশ্ন।

বাস্তবিকই কী ভীষণ প্রাসঙ্গিক মনে হয় প্রতিটি বাক্য এই একশো বছর পরেও। আসলে 'আবোল তাবোল' নামকরণের মতোই আমরা যদি বিষয়টাকে একটু উল্টে নিয়ে দেখি, তবে বোঝা যায় সুকুমার রায় তাঁর সৃষ্ট সর্বজ্ঞ তাত্ত্বিক, তার্কিকদেরই আসলে সমালোচনা করতে চেয়েছেন, যারাই আসলে কারো আপত্তির তোয়াক্কা করে না, জগতকে যাদের বধির মনে হয়, কিন্তু এরা চায় সবাই তাদের কথা বিনা তর্কে এক বাক্যে স্বীকার করে নিক। এই তত্ত্বজ্ঞানীদের মনে সবজান্তা ভাব, এদের মনে সত্যের যে নির্বিকল্প ছাঁচটা বদ্ধমূল হয়ে আছে, তার এক চুল নড়চড় হলেই যেন বিশ্বসংসার রসাতলে যাবে। এরা নিজেরা নিজেদের জ্ঞানের আলোর ধাঁধাঁয় পড়ে আছে আর অন্যদেরও ফেলতে চাইছে। সংকীর্ণ একমাত্রিকতায় আক্রান্ত এদের জ্ঞানের সীমা নিখুঁতভাবে মাপা, ''ছকের বদল অসম্ভব''। এর বাইরে সবকিছুই অবান্তর, অযৌক্তিক, এরাই যেন অগ্রগতির গতি। দুনিয়ার হতভাগ্যদের এদের দ্বারস্থ হতেই হবে। নিজস্ব বুদ্ধি-চিন্তা-স্বকীয়তাকে বিসর্জন দিয়ে এদের জ্ঞান কর্তৃত্বকে নির্বিচারে মেনে নিতে হবে। আর এখানেই আছে ক্ষমতার খেলা। অবুঝ শ্রোতার ঔদাস্য দেখে তাই তত্ত্ব জ্ঞানীরা, সুকুমার শ্রেষ্ঠ চরিত্ররা রেগে ওঠে। ক্ষমতার লোভ কেই-বা ছাড়তে চায়? তাই 'বুঝিয়ে বলা'র শ্যামাদাস অযাচিত পরামর্শদাতার বাগাড়ম্বরে অতিষ্ট হয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানালে সে ধমকে ওঠে — 'কি বল্লি তুই? এসব শুধু আবোল তাবোল বকুনি?'

এই 'আবোল তাবোল' শব্দের অর্থ কিন্তু আর 'হাল্কা হাওয়ায়' ভেসে যায় না। ঔপনিবেশিক ভারতে না-শোনাটাই প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে জ্ঞানবৃদ্ধের মেজাজকে সপ্তমে চড়িয়ে দেয়। নন-সেন্সের আদলে, অবাস্তবতার আড়ালে সুকুমার সাহিত্য তাই গভীর উপলব্ধির বিষয়, শুধুমাত্র শিশুপাঠ্য নয়। পরিচিত বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও বাস্তবের প্রতিস্পর্ধী এক স্বতন্ত্র পৃথিবী, এক অনন্য শিল্প মাধ্যম। — যেখানে মৃত্যুর কয়েকদিন আগে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ সুকুমার তাঁর 'আবোল তাবোলে' -এর 'শেষ নাম' কবিতায় লেখেন—

''আজকে দাদা যাবার আগে
বলব যা মোর চিত্তে লাগে
নাই বা তাহার অর্থ হোক
নাই বা বুঝুক বেবাক লোক।"

ঔপনিবেশিক কলকাতার ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের আচার-আচরণের মধ্যে যে অসংগতি ছিল তাকেই কবি আক্রমণ করেছিলেন মজার মোড়কে। 'সাবানের স্যুপ' আর 'মোমবাতি খাওয়া' কোলোনাইজড বাঙ্গালি তো সেকালে ট্যাঁশগরুর সমগোত্রীয় ছিলই। গায়ে-পড়ে-ঝগড়া-করা ভঙ্গিতে শুদ্ধ-অশুদ্ধ হিন্দি ইংরেজি মিশ্রিত ভাষায় চোটপাট করলেও ('নারদ-নারদ') কৃতিত্বে তারা আসলে অপদার্থ। দাঁত-নখহীন, নিরীহ, দুধভাত খাওয়া দু একটা জ্যান্ত সাপকে ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করে নিজেদের বীরত্ব জাহির করতে চায়। বাঙালি সমাজের এই নঞর্থক পরিণতি সুকুমার রায়কে বাধ্য করেছে বাবু-কালচারের বিরুদ্ধে, ইংরেজের পা-চাটা এক ঔপনিবেশিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ হাসি হাসতে। কেননা, এই জাতটা অনেক হম্বি-তম্বি হাঁক-ডাক সেরে সন্ধি প্রস্তাব মেনে নিয়ে যে যার ঘরে ফেরে নির্বিঘ্নে নিরাপদ জীবনের স্বচ্ছলতায়। পরাধীন দেশেও সবরকম বঞ্চনার আঁচ বাঁচিয়ে স্বার্থপরের মত মুখ লুকোয় নিরুত্তাপ, নিস্তরঙ্গ অথচ বিলাসী জগতে। এদের নিয়েই সুকুমারের ননসেন্সের জগৎ। এই জগতের সৃষ্টিই হোলো সাহিত্যিক সুকুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি যা একশো বছর পরেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা, অহমিকা, দুর্নীতি পরায়ণতার বিরুদ্ধে সরব হতে তিনি ভিন্নমাত্রিক পথপ্রদর্শক।

চলুন আর একবার 'আবোল তাবোল' এর পাতা ওল্টাই, খোলা চোখে বিশ্লেষণী মনে আর একবার ভেবে দেখি ক্লেদাক্ত সমাজকে বদলানো যায় কিনা। ধন্য সুকুমার! শতবর্ষ পরেও!

" True or positive nonsense writing is never intended to make formal sense, nevertheless it has a kind of internal lunatic logic of its own, and often comprises enigmatic variations on the absurd"

-- Dictionary of Literary Terms

প্রবন্ধ

সুকুমার রায়ের বিজ্ঞান ভাবনা

বাসব বসাক, এফ-ই-৫১২/৭

বহু বছর আগে কবি বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, ''সুকুমার রায়কে আমি বরাবর শ্রদ্ধা করেছি শুধু হাস্য রসিক বলে নয়, শুধু শিশু সাহিত্যের প্রধান বলে, বিশেষ ভাবে সাবালক লেখক বলেও। তাঁর কথা ভাবলে অনিবার্যত মনে পড়ে ল্যুইস ক্যারোলের যুক্তি চালিত বিস্ময় বোধ''। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পুত্র ও সত্যজিত রায়ের পিতা সুকুমারের জীবনকাল মাত্র ছত্রিশ বছর স্থায়ী হতে পেরেছিল। অথচ এই নিতান্ত স্বল্পস্থায়ী জীবনে তিনি সুচারু দক্ষতায় তাঁর ক্ষুরধার মেধা, গভীর মনন, তীব্র শ্লেষ ও নির্মল কৌতুকের মিশেল দিয়ে বাংলা সাহিত্যে যে সম্পূর্ন নতুন ও চিত্তাকর্ষক ধারার জন্ম দিয়ে গেছেন তা আজও সমান জনপ্রিয়। আপাত শিশু সাহিত্যের আড়ালে তঁর লেখায় ফুটে উঠেছে সমসাময়িক সমাজ ও রাজনীতির বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ শ্লেষ; গোপন থাকে নি তাঁর গভীর বিজ্ঞান মনস্কতাও। তাই সুকুমার রায়কে কেবলমাত্র শিশু সাহিত্যিক হিসাবে দেগে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

সুকুমারের লেখায় ক্যারোলের বাহ্যত আপাত অর্থহীন ননসেন্স ছড়ার আক্ষরিক অনুবাদের বদলে আদ্যন্ত বঙ্গীকরণ ঘটে গিয়ে এক অনন্য মাত্রা যোগ হয়েছে যা অচিরেই আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্বিশেষে সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছে। ক্যারোল ছিলেন নামি গণিতজ্ঞ। সুকুমারও ছিলেন পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ণে জোড়া সাম্মানিক ডিগ্রিধারী অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। তাই হয়তো এ্যালিসের রূপকার ক্যারোল আর হযবরল-র স্রষ্টা সুকুমার যেন কোথাও কোথাও কৌতুকের রসায়ণকে সুনিপুণ দক্ষতায় অতি স্বচ্ছন্দে মিলিয়ে দিতে পেরেছেন তাঁদের বৈজ্ঞানিক মনন ও যুক্তিবোধের বিন্দুতে। সেই কারনে ছোটদের সঙ্গে বড়রাও দিব্যি সুকুমার রায়ের লেখায় আপাত অসম্ভবের সম্ভাব্যতায় তাঁর বিশ্লেষণমুখী (এ্যানালিটিকাল) মননের সতর্ক কৌতুকপ্রিয়তা সহজেই অনুভব করতে পারেন।

১৮৯৫ সাল থেকে শ্রদ্ধেয় শ্রী শিবনাথ শাস্ত্রী 'মুকুল' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞানের জটিল তত্বকথা সাধারণের বোধগম্য সহজ ভাষায় উপস্থাপন করা। ওই পত্রিকায় প্রখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসুও প্রায় নিয়মিত লিখতেন। ১৯০৬ সাল নাগাদ এহেন পত্রিকায় 'সূর্যের রাজ্য' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন মাত্র উনিশ বছরের সদ্য যুবক সুকুমার; যে প্রবন্ধে সহজ ও সরস কথায়, সাবলীল ভঙ্গীতে সৌর জগতের গ্রহগুলির সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় ঘটাতে প্রয়াসী হন তিনি। মনে রাখা ভালো তখনও পর্যন্ত কিন্তু এক অক্ষয় দত্ত ছাড়া কেউ সেই ভাবে জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনার কাজ শুরু করেন নি বাংলায়। অবশ্য সুকুমারের বাবা উপেন্দ্রকিশোরের কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা এর আগেই প্রকাশিত হয়ে গেছে।

সুকুমার রায় ১৯১১ সালে বৃত্তি নিয়ে বিদেশে যান মুদ্রণ প্রযুক্তি শিখতে। এর আগেই যদিও তিনি লিখে ফেলেছেন তীব্র শ্লেষ ও সরস কৌতুকে ভরপুর দু'দুটি নাটিকা — 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষণের শক্তিশেল'। তাঁর গভীর বিজ্ঞান বোধ ও নিবিড় অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর একাধিক রচনায়। 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'চিরন্তন প্রশ্ন' শীর্ষক তাঁর একটি নিবন্ধে তিনি লিখছেন, ''আজকাল পরমাণু সম্বন্ধে সূক্ষ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার মধ্যে একান্ত অনিত্যতার যে সকল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে তাহার ফলে বিজ্ঞান তাহার পূর্বতন নিশ্চিন্ত ভরসা হারাইয়া, এখনো কোনো কিছুকে নিত্য বলিতে সাহস পায় না''। পরমাণুর এই অনিত্যতার কথা বলতে গিয়ে সুকুমার যে নিশ্চিত ভাবেই নিলস বোরের সদ্য প্রকাশিত তত্বের

দিকেই নির্দেশ করেছেন সে কথা বলাই বাহুল্য।

পাশাপাশি 'প্রবাসী'তেই প্রকাশিত তাঁর 'দৈবেন দেয়ম' প্রবন্ধে তিনি কুসংস্কারের সমর্থনে বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যার চেষ্টাকে তীব্র কশাঘাত ক'রে লিখেছেন, ''বিজ্ঞানের জুজু যখন টিকিতত্ব ও গঙ্গাজল-মাহাত্ম্যের সমর্থনেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তখন দেববাদ ও বিজ্ঞানের দোহাই দিবে, সেটা কিছু বিচিত্র নয়''।

সুকুমার রায় ১৯১৪ সাল থেকে সন্দেশ পত্রিকায় শিশু কিশোরদের জন্য নিয়মিত লেখালিখি শুরু করেন। এই পর্বে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'সূক্ষ্ম হিসাব' আদতে সরল ভাষায় ভৌত বিজ্ঞানের নানা মাপজোক নিয়ে লেখা। এর বছর দুয়ে'কের মধ্যেই শিশুমনে জ্ঞানানুসন্ধানের ঔৎসুক্য জাগিয়ে তুলতে একে একে 'পতঙ্গভূক উদ্ভিদ', 'গোরিলা', 'সাবমেরিন' এই সব বিজ্ঞানের নানা বিচিত্র বিষয়ে লেখা শুরু করেন তিনি।

১৯১৫ সালে উপেন্দ্রকিশোরের প্রয়াণ ঘটলে 'সন্দেশ' পত্রিকার দায়িত্ব বর্তায় যুবক সুকুমারের কাঁধে। পত্রিকার দায়িত্ব ভার কাঁধে নিয়ে অনেকটা বুক অব নলেজের ধাঁচে বিশ্বজগতের জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে তিনি লিখতে শুরু করেন পাঠকদের জন্য। মনে রাখা ভালো সেই সময় পর্যন্ত বুক অব নলেজ প্রকাশিত হয় নি। প্রশান্ত চন্দ্র মহালানবিশ লিখছেন, ''তাতা দার কাছেই আমরা প্রথম সন্ধান পেলাম বাইরের এই বিশ্বজগতের কথার। একদিকে উল্কা, নক্ষত্র, ধূমকেতু, নীহারিকা মন্ডিত সুদূর আকাশের গল্প, প্রাণী জগতের কত অদ্ভুত কথা আর আরেক দিকে বিজ্ঞান জগতের নূতন আবিষ্কার, ফটোগ্রাফ, মাইলস্কোপ, ফনোগ্রাম, টেলিগ্রাম, ইলেকট্রিসিটি, রেডিয়াম, এক্স-রে কত কি, তার ঠিকানা নেই''।

পত্রিকার প্রয়োজনে জীবনীমূলক প্রবন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি যে কেবল বিজ্ঞানীদের জীবনীই বেছে নিলেন তা নয়, গল্পের ছলে তাঁদের আবিষ্কারগুলি সম্পর্কেও ধারনা দিলেন প্রতিটি রচনায়। তাঁর 'ডারউইন' বিষয়ক প্রবন্ধটি থেকে এ বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ডারউইন বর্ণিত প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ব বোঝাতে সুকুমার লিখছেন, ''মানুষের বুদ্ধিতে যেমন নানা রকম বাছাবাছি চলে, প্রাণিজগতেও সর্বত্র সেইরূপ বাছাবাছি চলে। বাঁচিবার মত গুণ যাহার নেই, সে বেচারা মারা যায়। আর সেই সব গুণ আর লক্ষণ যাহাদের আছে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের বংশবিস্তার হয়, আর বংশের মধ্যে সেই সব বাছাবাছা গুণগুলিও পাকা হইয়া স্পষ্ট হইয়া ওঠে''। ডারউইনের অমোঘ তত্বটির কি অপূর্ব ব্যাখ্যান, কি চমৎকার উপস্থাপনা। আজ শতাধিক বছর পরেও যখন এক দল অপগন্ড ডারউইনের এই বৈজ্ঞানিক তত্বটিকে খারিজ ক'রে উদ্ভট সৃষ্টি তত্বের সপক্ষে গলা ফাটাচ্ছে তখন প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ব বিষয়ে সুকুমার রায়ের উপলব্ধি ও বোঝা পড়া এবং তার এমন সহজিয়া প্রকাশভঙ্গীর কথা ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।

'বেগের কথা' প্রবন্ধে মেকানিক্স বা বলবিদ্যার একেবারে গোড়ার কথাটি অনন্য সহজিয়া শৈলীতে বললেন তিনি, —''তাল গাছের উপর হইতে ভাদ্রমাসের তাল যদি ধুপ করিয়া পিঠে পড়ে তবে তাহার আঘাতটা খুবই সাংঘাতিক হয়; কিন্তু ঐ তালটাই যদি গাছ হইতে না পড়িয়া ঐ পেয়ারা গাছ হইতে এক হাত নিচে তোমার পিঠের ওপর পড়িত তাহা হইলে এতটা চোট লাগিত না। কেন লাগিত না? কারন বেগ কম হইতো''। ভরবেগ ও বলের সম্পর্ক এর থেকে ভাল ক'রে বোঝানো সম্ভব কি আদৌ!

বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের অগম্য এমন ভ্রান্ত ধারনাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি কখনো। বরং মজার ছলে সহজ কথায় তিনি বিজ্ঞানকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের দরবারে। আর সে কারনেই মজার মজার প্রতিশব্দ তৈরি করেছেন কিছু বিজ্ঞান নির্ভর ইংরাজী শব্দের। যেমন টিউব রেলের বাংলা করেছেন সুকুমার 'ভুইফোঁড়', এক্স-রে তাঁর কলমের খোঁচায় হয়েছে 'হাড্ডিসার ছায়া' অথবা রকেট হয়েছে 'হাউই'। আবার তাঁর 'হাত গণনা' কবিতায় হাত দেখা ও তথাকথিত ভাগ্য গণনার বুজরুকির বিরুদ্ধে আমরা উচ্চারিত হতে দেখেছি তীব্র শ্লেষ। অন্যদিকে বিজ্ঞানের আলোচনা করতে গিয়ে কখনো মাস্টার হয়ে ওঠেন নি সুকুমার। বরং তাঁর লেখা পড়তে পড়তে কিশোরমন কখন যেন ঢুকে পড়েছে জ্ঞানের উদ্ভাসিত জগতে। 'সূর্যের কথা'

প্রবন্ধে তিনি লিখছেন, ''সূর্য ঘন্টায় প্রায় কুড়ি হাজার মাইল পথ ছুটছে। সূর্যটা দশ লক্ষ বছর এইভাবে ছুটলেও কোনো তারার কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা নেই। তোমরাই হিসাব ক'রে দেখ — এক ঘন্টায় যদি ২০০০০ মাইল যাওয়া যায় তাহলে দশ লক্ষ বছরে কত মাইল? ২০০০০ x ২৪ x ৩৬৫ x ১০০০০০০। তাহলে এক একটা তারা কত দূরে একবার ভাবতে চেষ্টা কর''। এই সব ভাবতে ভাবতে কোনো কিশোর কত সহজে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারে বা ঢুকে যেতে পারে প্রমাণ নির্ভর বিজ্ঞানের জগতে তা ভাবলে আশ্চর্য্য না হয়ে পারা যায় না। এ ভাবেই তো মানুষ বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে ওঠে।

আবোল তাবোলে উল্লেখিত চন্ডীদাসের খুড়োর আজব কলের অমন নক্সা অথবা 'ফুটোস্কোপের' মত কাল্পনিক যন্ত্রের ধারনা বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকলে কল্পনায় ফুটিয়ে তোলা যে দুষ্কর তা আশা করি পাঠক মাত্রই মানবেন। প্রযুক্তি; বিশেষতঃ আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে বিলেত থেকে শিক্ষালাভ ক'রে এসেছিলেন সুকুমার। এ নিয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল সর্বজনবিদিত। হাফটোন মুদ্রণ নিয়ে তিনি নিবিড় গবেষণা করেছেন। কিন্তু এক সময় গবেষণার নির্দেশক ফিশেনডেনের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য হয় এবং বিরোধ বাধে। বিরক্ত সুকুমার সেই সময় বিলেত থেকে তাঁর বাবাকে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন,''মাস্টাররা সব রকম কাজে credit নেবার জন্য এমন নির্লজ্জ ভাবে অন্যের কাজের মধ্যে share claim করে যে আমি ঠিক করেছি যা শিখবার এখানে শিখে নি; আমার কোনো কাজে এদের ভাগ দিয়ে দরকার নেই'। এতদসত্বেও প্রখ্যাত পেনরোজ এ্যানুয়ালে হাফটোন বিষয়ে সুকুমার রায়ের বেশ কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার, তাঁর গবেষণার মৌলিকত্বের কারনেই তিনি রয়াল ফটোগ্রাফি সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সুকুমারের লেখায় যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান চেতনার প্রকাশ বিষয়ে যথাযথ আলোকপাত করেছেন হিরণ কুমার সান্যাল, ''ওঁর মনটা যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক, কেননা একটা বিজ্ঞান শিখনের মধ্যে দিয়ে তিনি গিয়েছিলেন। সেই কারনে সুকুমার যে বিষয়েই লিখুন, শিল্পকলা হোক, সাহিত্য হোক — তার মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক মনের দীপ্তি পাওয়া যায়। অথচ সাহিত্যরস! একেবারে জাত সাহিত্যিক''। তাঁর বৈজ্ঞানিক মনন ও যুক্তিবাদের প্রতি আকর্ষণ তৈরিতে বাবা উপেন্দ্রকিশোরের প্রভাব অনস্বীকার্য। লীলা মজুমদার লিখছেন, ''যন্ত্রপাতির ঘরে নিয়ে গিয়ে উপেন্দ্রকিশোর শিশু সুকুমারকে দূরবীনের সাহায্যে চাঁদের দৃশ্য, অনুবীক্ষণ দিয়ে পোকামাকড় দেখাতেন। দল বেঁধে চিড়িয়াখানায়, যাদুঘরে যাওয়া হ'ত। উপেন্দ্রকিশোর সমস্ত দর্শনীয় বস্তুগুলির বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিতেন''।

আজ যখন বিজ্ঞান চেতনার ওপর নতুন আঙ্গিকে আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে, যখন পুরাণ-কথাকে ইতিহাস ব'লে চালিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য অপচেষ্টা চলছে, তখন এমন মুক্তমনা যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল মানুষ তথা সাহিত্যিকের অভাব বড় প্রকট হয়ে উঠছে। এই কঠিন সময়ে বাঙালি জাতিকেই আজ ঠিক করতে হবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, প্রফুল্ল রায়, জগদীশ বোস, রবীন্দ্রনাথ অথবা আরও একটু পরের সুকুমার রায়, মেঘনাদ সাহাদের উত্তরাধিকারের জন্য সে গর্ব বোধ করবে কিনা; কুসংস্কার ও গোঁড়ামির বিপ্রতীপে এই বাঙলার যুক্তিবাদ ও তার চর্চার প্রতিস্পর্ধী ঐতিহ্যকে বহন করতে সে আজ প্রস্তুত কি না।

১৯২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে প্রয়াত হন তাঁর সময়ের থেকে অনেক খানি এগিয়ে থাকা এই মানুষটি। সুকুমারের মৃত্যুতে শোকাহত রবীন্দ্রনাথ লেখেন, ''আমি অনেক মৃত্যু দেখেছি। কিন্তু এই অল্পবয়স্ক যুবকটির মত, অল্পকালের আয়ুটিকে নিয়ে মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে অমৃতময় পুরুষকে অর্ঘ্যদান করতে প্রায় আর কাউকে দেখি নি''। এ যেন আমাদেরও মনের কথা। আমৃত্যু আলোক দিশারী সুকুমার রায় তাঁর কবিতায় আবাহন করেছেন যাবতীয় অন্ধকার ধুয়ে দেওয়া দ্যুতিময় আলোর ঝর্নাকেই। -

পূব গগনে রাত পোহাল,
ভোরের কোণে লাজুক আলো
নয়ন মেলে চায়।
...
আয়রে নেমে আঁধার পরে,

পাষান কালো ধৌত ক'রে
আলোর ঝরনায়।

আলসভরা আঁখির কোণে,
দুঃখ ভয়ে আঁধার মনে
আয়রে আলো আয়। (সংক্ষেপিত)

তমসো মা জ্যোতির্গময়ঃ।

বিজ্ঞান চেতনা ও যুক্তিবাদের আলোয় যাবতীয় অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হোক। সুকুমার রায় তো তেমনটাই চেয়েছিলেন।

ধাঁধাঁ
ইতিবৃত্ত বৃত্তাকার

১। সবাই কে দমন করে শাসন করেন যিনি।
আমাদের দেশটাকে তাঁর নামেই চিনি।

২। সাগর পারের শাসক তিনি
ক্ষমতা চান শুধুই একা।
রক্তরাঙা হাত দুটি তাঁর
খুনের গন্ধ মাখা।

৩। বিজয় দর্পে রাজ্যগ্রাস,
শোকের কান্না গগনস্পর্শী।
নিজে তিনি শোক রহিত,
স্বনামে তিনি প্রিয়দর্শী।

৪। কৃষ্টির দেশের মহিষী তিনি, 'কেক' খাবার দিলেন বিধান।
ভুখার রাজ্য তাই তো তাঁকে দিল
চরম দণ্ডদান।

৫। এদেশে রাজ্য তাঁর,
পৃথিবীর অধীশ্বর।
নিদান কালে আবাস তাঁর
চার দেয়ালে ঘেরা গড়।

৬। পোপের দেশের নিঠুর রাজা, আপন সখে মশগুল।
স্বভাবে নেই প্রজা রঞ্জন,
বাঁচুক তারা কিংবা মরুক।
দেশে যখন জ্বলছে আগুন, বেহালা তাঁর তুলছে সুর।

৭। সার্থকনামা নৃপতি, সঙ্গমে স্নান,
নিঃশেষে। স্নান শেষে রত্নাভরণ করেন দান।

৮। ভৃত্য থেকে নরপতি, বংশ হল গড়া।
রাজধানীতে তাঁর নামে স্তম্ভ আছে খাড়া।

৯। বিষ্ণুর প্রিয়া তিনি বিত্তের দেবী।
মন্ত্রণায় একদা তিনি দেশের কান্ডারী।

১০। কুরুকুল বধূ তিনি
পাণ্ডব পঞ্চ তাঁর পতী।
আধূনিক ভারতের তিনি রাষ্ট্রপতি।

— পূর্ণিমা সেন, এফ ই ৩৩৩

প্রবন্ধ

নেতাজির আলোকশিখা

ভবেশ দাশ, এফ ই ৫০১

সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কথা বলতে গিয়েই, বারবার আমার একটা কথা মনে হয়, তাঁর প্রতি আমাদের কীসের আকর্ষণ, তিনি আমাদের এত টানেন কেন? এ কী নিতান্তই আবেগ, নাকি তাঁর তেজস্বিতা, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সাহসী পদক্ষেপ? নাকি তাঁর অসম্ভব সংগঠনশক্তি আর আত্মবিশ্বাসের জোর? অথবা সুভাষের চারিত্রিক মনোবল? নাকি স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন-উজ্জ্বল এক ছবি রচনা করার অতুলনীয় মেধা? এর মধ্যে কোনটা? আমি বলব, এর সবকটা। কিন্তু এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আশ্চর্য এক গুণ, যাকে আমরা বলতে পারি, বিরলতম রাজনৈতিক প্রতিভা, তা হলো সংগ্রামের কঠিনতম এবং জটিলতম মুহূর্তেও কোনোরকম আপোশ না করার শক্তি।

এই যে আপোশ না করা, এই সততার জন্য সুভাষচন্দ্রকে অনেক উপেক্ষা, তাঁকে তাচ্ছিল্য করা, তাঁকে নিয়ে বিভ্রান্তিজনক কত প্রচার চলেছে, তার চেয়েও বড়ো কথা তাঁর কোনো সাফল্যকে বাঁকা চোখে দেখা, তাঁর প্রতিস্পর্ধী চিন্তাকে উপহাস করা থেমে ছিল না। বড়োমাপের অনেক নেতাই সুভাষের সংসর্গ থেকে সাধারণ কর্মী ও যুবকদের সরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। দেশে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলাকালীন যেমন একথা সত্য, তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর দেশেও এই প্রবণতা থামেনি। ঠিক যেমন তাঁর মৃত্যু রহস্যকে দীর্ঘায়িত করা একটা চক্রান্তের মধ্যেই পড়ে, তেমনি কূটতর্কের ধোঁয়াশায় সুভাষের চিন্তা ও কাজকে আচ্ছন্ন করে রাখাও সত্যকে আড়াল করা। তবুও বলব এ এক সৌভাগ্য, সুভাষচন্দ্রকে সেই কৌশলে দূরে সরানো তো যায়ইনি, বরং সুভাষ আরও আলোকিত হয়েছেন আমাদের সামনে। আলোকিত হয়েছেন, কারণ আমরা আজ জাতীয়স্তরে যতরকম সমস্যা এবং জটিলতার মধ্যে দিয়ে চলেছি, চলতে বাধ্য করা হচ্ছে, স্বাধীনতার এত বছর পরেও আত্মতুষ্টিভরা যেন এক আশ্চর্য অমৃত মহোৎসবকালের মধ্যে দিয়ে চলেছি, সেই দুর্মর অভিজ্ঞতা আমাদের সুভাষচন্দ্রকে বারবার মনে করিয়ে দেয়। কারণ তিনি সম্পূর্ণ মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বাধীনতার আগেই দেশকে পুনর্গঠনের কথা ভেবেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের উন্নতি আর দারিদ্র্য দূর করার যে সুগভীর সংকল্প তাঁর ছিল, পরিকল্পিত অর্থনীতি নিয়ে তিনি যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে সকলকে ভাবাতে চাইতেন, আজকের নীতি-আয়োগের কুহকের মধ্যে দিয়ে তার গুরুত্ব বোঝা যাবে না।

সুভাষচন্দ্রের আধুনিকতার বোধ, দেশের উন্নয়নে শিল্প ও বিজ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগের জন্য তাঁর চিন্তাকে বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। নইলে মেঘনাদ সাহাকে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির সঙ্গে যুক্ত করতেন না। তাঁর কাছে ছাত্রের মতো সুভাষ শিখতে চাইতেন না যে কীভাবে বিজ্ঞানসম্মত পথে দেশে শিল্পায়ন সম্ভব। ১৯৩৮-এর ১৯শে নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ জওহরলালকে চিঠিতে লিখছেন যে, 'মেঘনাদ সাহার সঙ্গে আমার চমৎকার আলোচনা হলো। ভারতীয় শিল্পের বিকাশ সম্পর্কে তাঁর যে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা, তা আমাকে খুশি করেছে। তোমরা এ সম্পর্কে কী ভাবছ আমাকে জানিও।'

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ থেকে নেহেরুকে এই চিঠি লিখছেন ওয়ার্ধায়। ঠিকানায় লেখা আছে কেয়ার অফ মহাত্মা গান্ধী। আমরা আশা করব গান্ধীজিও সেই চিঠি পড়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কী মত, তা আমরা জানি না। স্বাধীনতার পরে দেশের অর্থনীতিতে আমরা পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা দেখি বটে, কিন্তু সুভাষচন্দ্রই যে এর প্রথম প্রবক্তা, সে স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। কংগ্রেসের সভাপতি পদের নির্বাচনে সুভাষচন্দ্র যাঁকে পরাস্ত

করেছিলেন, কংগ্রেসের সেই 'সরকারি' ইতিহাসকার পট্টভি সীতারামাইয়া অবশ্য স্বীকার করেছিলেন সেকথা। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের জয়ে খুশি হতে পারেননি গান্ধীজি। তিনি ওই নির্বাচনকে 'জালিয়াতি' পর্যন্ত বলেছেন। তিনি সুভাষকে misguided patriot, কখনো spoilt child বলেছেন। কিন্তু সেই গান্ধীকেই আবার বলতে হয়, 'অন্যের পক্ষে যে-কাজ করতে কয়েক যুগ লেগে যেত, বসু তা কয়েক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন করেছিলেন।' গান্ধীর মতে অস্ত্রের ব্যবহার দুঃখজনক হলেও, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সুভাষের কীর্তি ও অবদান সীমাহীন ছিল।' জওহরলালেরও ধারণা ছিল এইরকমই। আবার ১৯৩৩ সালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য প্রচারে নেতাজি যখন ইউরোপে যাচ্ছিলেন, তখন সুভাষ গান্ধীর কাছে একটি শংসাপত্র চেয়েছিলেন, যাতে তাঁর কাজের সুবিধে হয়। গান্ধী কিন্তু তা দেননি। কারণ যে অহিংস আন্দোলনের কথা গান্ধীজি বলেছেন, সুভাষকে তিনি সেই পথের পথিক মনে করেননি এবং কোনো নেতা হিসেবে গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁর প্রশ্নহীন আনুগত্য সুভাষ মানতে পারেননি।

অনেক ক্ষেত্রেই গান্ধীজির স্ববিরোধ রবীন্দ্রনাথেরও নজরে এসেছে। গান্ধীর প্রতি রমা রলাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তাঁদের মধ্যে চিঠিপত্রও বিনিময় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ একসময়ে রলাঁকে বলেছিলেন গান্ধী সম্পর্কে — 'খুবই জটিল তাঁর চরিত্র, মহনীয়তার সঙ্গে ক্ষুদ্রতার এমন সমন্বয় সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর মনে গোপনে একটা সততার অভাব আছে। তাই তিনি নিজের মনে নানারকম কূট তর্কজাল বিস্তার করে নিজেকে এবং অপর সাধারণকে বোঝাতে চান, তিনি যে-সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেগুলি বিশুদ্ধ এবং দৈবী প্রণোদিত। বিকল্প বা বিরুদ্ধ মত সত্য হলেও এবং সেটা সত্য বলে জানলেও তিনি অনেক সময়ে তা স্বীকার করতে চান না।'

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে যখন সুভাষচন্দ্রকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা হয়, সেই ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বলছেন, 'ভারতের বিশেষ করে, বাংলার জটিল পরিস্থিতির কথা মনে রেখে দেশের ঐক্য এবং বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সুভাষচন্দ্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হোক, তাঁকে আন্তরিক সহযোগিতার আমন্ত্রণ জানানো হোক।'

রবীন্দ্রনাথ যে জাতীয় ঐক্য এবং বৃহত্তর স্বার্থের কথা বলেছিলেন, তার মধ্যে ঐক্যবদ্ধ অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নও লুকানো ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল, সুভাষচন্দ্রই পারবেন স্বাধীনতার আন্দোলনকে সেই পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। বরং গান্ধী কখনো সুভাষকে ঠাট্টা করে বলেছেন, 'ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য তোমার প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, তবে অভিনন্দনের প্রথম টেলিগ্রামটি তুমি আমারই পাবে। আবার আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে বলেছেন, যদি আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মুক্তি এনে দিতে সক্ষম হতো, তাহলেও আমি তাকে ব্যর্থতাই বলতাম। কারণ জনগণ তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারত না।'

অথচ এই ফৌজ এবং আজাদ হিন্দ সরকার গঠনের জন্য সুভাষচন্দ্রকে যে কতরকম আপোশহীন কৌশল এবং কঠিন ব্রত পালন করতে হয়েছে, তা এই ফৌজের বীর সেনা এবং দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ইতিহাসকারেরা জানেন। আজাদ হিন্দ ফৌজ বলতে শুধু একটি সশস্ত্র বাহিনী নয়, তার প্রচারের জন্য বিশ্বজনমত প্রভাবিত করার জন্য যে বেতার-সম্প্রচার ব্যবস্থার প্রয়োজন, ডাক যোগাযোগ এবং ডাকটিকিটের মধ্যে দিয়ে স্বনির্ভর বিশ্বস্ততা আদায় করা প্রয়োজন, দেশের বাইরে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সুভাষ সে-কাজ করেছেন। আমরা যখন দেখছি ১৯৪৫-এর ২৪ এপ্রিল নেতাজি যখন রেঙ্গুন ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, তখনও তিনি অশেষ মন-খারাপ নিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের বীর অফিসার ও সেনাদের প্রতি শেষ ভাষণে বলে যাচ্ছেন, 'ভারতের স্বাধীনতায় আজও আমার অখণ্ড বিশ্বাস আছে, আজ আমি আমাদের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা আমাদের জাতীয় সম্মান এবং ভারতীয় যোদ্ধাদের বিশেষ সুনাম তোমাদের যোগ্য হস্তে অর্পণ করে যাচ্ছি। ...

১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর তারিখে আমি যে শপথ গ্রহণ করেছি, সেই শপথ অনুযায়ী কাজ করব, এবং সাধ্যমতো আটত্রিশ কোটি স্বদেশবাসীর সেবা করব ও শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার যুদ্ধ চালিয়ে যাব।'

এর চারমাস পরেই তাইহোকু বিমান দুর্ঘটনা ঘটবে।

আমরা বলছিলাম, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার কথা। স্বাধীনতার সঙ্গে দেশ দু-টুকরো হয়ে যাবার কুফল যে কী তা আমরা আজও বুছতে পারছি। কিন্তু সুভাষচন্দ্র আমাদের জোরের সঙ্গে ভরসা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন — 'একাধিক কারণে পাকিস্তান একটি আজগুবি পরিকল্পনা এবং অকার্যকর প্রস্তাব। ভৌগোলিক ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষ একটি অবি ভাজ্য দেশ। দ্বিতীয়ত, ভারতের অধিকাংশ অংশেই হিন্দু ও মুসলমানরা এমনভাবে মিলে গেছেন যে তাদের পৃথক করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, জোর করে যদি মুসলমান রাষ্ট্র গঠন করা হয়, তা হলে এইসব রাষ্ট্রে নতুন করে সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি হবে, যার ফলে নতুন নতুন অসুবিধে দেখা দেবে। চতুর্থত, হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রে ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই না করলে তাঁদের পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয় এবং স্বাধীন ও অবিভক্ত ভারতের ভিত্তিতেই কেবল তাঁদের সেই ঐক্য সম্ভব।' ১৯৩৮-এ মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গেও সুভাষের বৈঠক হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, সুষ্ঠু চিন্তা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব দিয়ে সুভাষ নিশ্চয়ই যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছোতেন।

১৯৩৯-এর কংগ্রেসী রাজনীতির অস্থিরতার সময়ে মহাত্মা গান্ধীকে নেতাজি একবার জানিয়েছিলেন, 'আপনি যা বলেন বা বিশ্বাস করেন, আমার দেশবাসীর অনেকেই যেমন অন্ধভাবে তা অনুসরণ করে, আমি তা করি না।' এমনটাও বলেছেন, 'রাজনীতির ক্ষেত্রে একদিনের জন্যও থাকব না, যদি থাকার ফলে ভদ্রতার মানদণ্ড থেকে আমার পতন ঘটে।' প্রসঙ্গত এও বলেছেন, 'আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা আমার নামে কত না কাহিনী আপনার কানে তুলে চলেছে। কয়েকমাস হলো আমি জানতে পেরেছি কিছুকাল থেকে আমার নামে মুখে মুখে সূক্ষ্ম অথচ, দুরভিসন্ধিমূলক রটনা চলছে। '১৯৩৯-এর ৬ই এপ্রিল' সুভাষ লিখছেন, 'মহাত্মাজী, আপনি বিশ্বাস করুন এতদিন ধরে আমি কেবল একটি প্রার্থনা করে চলেছি একটু আলোর প্রার্থনা, যে আলো আমায় দেখিয়ে দেবে আমার দেশ ও দশের স্বাধীনতার পক্ষে কোন পথ শ্রেষ্ঠ। সেরকম প্রয়োজন ও কারণ দেখা দিলে যাতে নিজেকে নিঃশেষে মুছে ফেলতে পারি, তার জন্য শক্তি ও প্রেরণা কামনা করছি।'

এইসব কথা থেকে আমরা আন্দাজ করতে পারি, একটা সময়ে সুভাষচন্দ্রের মধ্যে কীরকম আলোড়ন চলেছে। কিন্তু আমরা চরম আশাবাদী ও তেজস্বী আপোশহীন সুভাষচন্দ্রকে ভুলতে পারি না। দেখি, জার্মানির রাশিয়া আক্রমণের বিরোধিতায় হিটলারের বিদেশমন্ত্রী রিবেনট্রপের সঙ্গে শিরদাঁড়া সোজা করে কথা বলতে।

তবে কেউ এটা ভাববেন না যেন এসব দৃষ্টান্তের মধ্যে দিয়ে জাতীয় জীবনে, স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজির ভূমিকাকে খাটো করতে চাই।

আমাদের হয়তো একটা কথা মাঝে মধ্যেই মনে পড়ে, ১৯১৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় ছাত্র সুভাষের সঙ্গে ইংরেজির বিখ্যাত অধ্যাপক ওটেন সাহেবের সংঘর্ষ ঘটেছিল। শোনা যায়, সুভাষ হাত তুলেছিলেন শিক্ষকের গায়ে। কিন্তু সেটা ব্যক্তিগত কোনো কারণে নয়। জাতির সম্মান রক্ষার সুদৃঢ় বিশ্বাসে। সেই সুভাষ যখন ১৯৪৫-এ বিমান দুর্ঘটনায় পড়লেন, সেই খবর শুনে ওটেন সাহেব কবিতা লিখেছেন। সেই কবিতার মর্মকথা সংক্ষেপে বলছি ঃ 'সুভাষ, তোমার হাতেই কি আমি একদিন লাঞ্ছিত হয়েছিলাম? আজ মনে পড়ে, তোমার দেশে তুমি যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলে, তা ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তুমি সাহসের সঙ্গে গ্রিক পুরাণের সেই বীর আকাইরাসের মতো আকাশে উঠে অমরাপুরীর দুর্গপ্রাচীর সংগ্রামের মধ্যে ভেঙে ফেলার দুর্জয় সাহসময় সংকল্প করেছিলে।... স্বদেশভক্তির আগুন প্রোজ্বলভাবে দীপ্তি পাচ্ছিল। ভারতীয় সেনাদলের সহস্র বিজয়ে সেই দীপ্তি ভাস্বররূপে প্রবাহিত হয়েছিল।'

কোনোরকম তোষামুদে বা আপোশমূলক স্বাধীনতা সুভাষ চাননি। সে যাইহোক, কিন্তু স্বাধীনতার পরে সুভাষচন্দ্রকে কি আমরা তাঁর প্রাপ্য মর্যাদার আসনও দিতে পেরেছি? ১৯৪৮-৪৯-এ সুভাষচন্দ্রের জন্মদিনে All India

Radio-তে কোনো অনুষ্ঠান করতে দেওয়া হয়নি। শিল্পীরা এজন্য রেডিয়োকে বয়কটের ডাক পর্যন্ত দিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ ছিলেন অনড়। কথায় কথায় বলেছেন দিল্লির অনুমোদন মিলছে না। বলা হয়েছে, ওরকম অনুষ্ঠান রাজনৈতিক। এতএব তা হতে পারে না। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সংগীত ও চলচ্চিত্রজগতের বহুশিল্পী এর প্রতিবাদ করেছিলেন। ফল হয়নি। তখন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, তিনিই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনিই উপপ্রধানমন্ত্রী।

এতসবের পরেও সুভাষচন্দ্রের লড়াই তাঁর দেশভক্তির মহিমা নিয়ে তাঁর যে ভাবমূর্তি, তা অম্লান। সেই ভাবমূর্তিকেই বিভ্রান্তি জড়ানো পথে ব্যবহারের চেষ্টা হয়ে চলেছে। দিনটাকে 'পরাক্রম দিবস' হিসাবে চিহ্নিত করলেও সুভাষের আদর্শ ও চিন্তার প্রতি শ্রদ্ধা কতখানি তা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। কেউ কেউ দলীয় আদর্শের সংকীর্ণ স্বার্থের খাঁচার মধ্যে সুভাষকে পুরে ফেলতে চান। পূজার ছলে তাঁকেই ভুলে থাকার চেষ্টা। তবু সুভাষের আলোকদ্যুতি চির অম্লান। সুভাষের সেই আলোকোজ্জ্বল শিখাগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ আমাদের করে যেতেই হবে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিনে সল্টলেক এফ-ই ব্লকের আবাসিক সমিতির সভায় পঠিত (২৩ জানুয়ারি ২০২৩)

" পরস্পর সহায়তা কর, পরস্পর বিনাশের চেষ্টা না করে পরস্পরের ভাল গ্রহণ কর, কলহ ছেড়ে মৈত্রী ও শান্তি আশ্রয় কর।''

— স্বামী বিবেকানন্দ

প্রবন্ধ

দাস মানসিকতা

সরজিৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়, এফ ই ৩৫৩

ক্রীতদাস প্রথা ঠিক কবে থেকে চলে আসছে তা বলা খুবই মুশকিল। হয়ত যবে থেকে মনুষ্য-পদধারী জীবরা যূথবদ্ধভাবে বাস করতে আরম্ভ করল তখন থেকেই কিছু লোক হুকুম করবে আর কিছু লোক সেই হুকুম বিনা প্রতিবাদে তামিল করবে। তবে যবে থেকে রাজতন্ত্র আরম্ভ হোল তখন থেকে নিশ্চিত ভাবেই ক্রীতদাস প্রথা চলে আসছে। রাজায় রাজায় যখন যুদ্ধ হত — যা প্রায়শই ঘটতো — তখন জয়ী রাজা বিজিত রাজ্যের সৈন্য সামন্ত এমনকি জনপদের অধিবাসীদেরও বন্দী করে নিজ রাজ্যে নিয়ে যেতেন ক্রীতদাস হিসেবে। ঔপনিবেশিক শাসনকালে এক দেশ থেকে অন্য দেশে শ্রমিকদের নিয়ে যাওয়া হত সেই দেশে কাজ করার জন্য। তারা চুক্তিনামায় সই করে সেই সব দেশে পাড়ি দিতেন। তাদের বলা হত চুক্তিবদ্ধ বা শর্তবদ্ধ শ্রমিক। তাদের জীবন কাটতো ক্রীতদাসের মতন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৮০৮ সালে আইন করে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিংকন আমেরিকা থেকে দাসত্ব প্রথা বিলুপ্ত করেন ১৮৬৩ সালে। তারপর থেকে এক এক করে সব দেশই এই প্রথাকে নিষিদ্ধ করে। বর্তমানে সব দেশেই ক্রীতদাসত্ব বে-আইনী। কোনও ব্যক্তির উপর আইনী মালিকানা রদ করা হলেও পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক দেশেই অন্য লোককে ক্রীতদাস করে রাখার জন্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া যায় না কারণ সেইসব দেশে কোনও ফৌজদারী আইনই নেই যারা ক্রীতদাসত্ব বা ক্রীতদাস-ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের শাস্তি দেবার জন্য। মনে করা হয় যদি ক্রীতদাসত্বই না থাকে তবে তা নিষিদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তাই বা কোথায়? কিন্তু ক্রীতদাসত্ব তো চলেই আসছে নানা রূপে, নানা ভাবে, নানা নামে যা আধুনিক ক্রীতদাসত্ব হিসেবে চিহ্নিত যেমন বেগারী, মানব পাচার কিংবা দাসত্ব, বশ্যতা বা দাস-ব্যবসার অনুরূপ। পৃথিবীর ৯৩ শতাংশ দেশই মানব পাচার বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে। কিন্তু অন্য সব শোষণ মূলক ব্যবস্থাকে সেই আইনের অন্তর্ভুক্ত করেনি। তার ফলে সেইসব শোষণমূলক ব্যবস্থার জন্য আদালতে মামলা রুজু করা যায় না। সারা বিশ্বে প্রায় ২.৫ কোটি মানুষ বেগারী প্রথার শিকার কিন্তু ১১২ টি দেশে বেগার-প্রথাকে শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞার বাইরেই রাখা হয়েছে।

কিছু কিছু দেশে শ্রমিকদের উচ্চ পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সব দেশে পদার্পণ করলেই তাদের পাসপোর্ট এবং অন্য সব প্রয়োজনীয় কাগজ দালালরা নিয়ে নেয়, যাতে তারা পালাতে না পারে। তাদেরকে একটা ছোট ঘরে গাদাগাদি করে রাখা হয় এবং যে পারিশ্রমিকের লোভ দেখিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল তাও দেওয়া হয় না। তাদের ক্ষেতখামারে, কলকারখানায়, নির্মাণ শিল্পে, রেস্তোরাঁ এমনকি গাঁজা চাষেও প্রায়ই বেগার খাটতে হয়। অথবা খুবই সামান্য পারিশ্রমিকে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে হয়। বেচাল দেখলেই কায়িক শাস্তি। কাউকে কাউকে আবার টাকার বিনিময়ে বিক্রী করা হয় বা উপহার হিসাবেও হাত বদল হয়।

ভারতীয় শ্রমিকেরা পশ্চিম এশিয়ার উপসাগরীয় অঞ্চলে বেশী পারিশ্রমিকের লোভে পাড়ি দিয়ে প্রায়ই এইরকম ব্যবস্থার সম্মুখীন হয় বলে সংবাদপত্রে প্রায়ই সংবাদ বেরোয়।

বাধ্যতামূলক শ্রম, জোরপূর্বক বিবাহ, শিশু পতিতাবৃত্তি, মানব পাচার, ঋণ দাসত্ব, গোলামী কিংবা ক্রীতদাসের মতো ব্যবহারকে আধুনিক দাসত্ব বলা হয়। বিশ্ব দাসত্বসূচক অনুযায়ী ২০১৬ সালে সারা বিশ্বে ৪৪.৮ মিলিয়ন মানুষ এই আধুনিক দাসত্বের শিকার যা ২০২২ সালে প্রায় ৫০

মিলিয়নে পৌঁছয়। আর ভারতের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা হচ্ছে এই রকম ২০১৪ সালে ৩৫.৮ মিলিয়ন, ২০১৬ সালের ১৮.৩৫ মিলিয়ন এবং ২০১৮ সালের ৮ মিলিয়ন। ক্রীত দাসত্বের এই সূচক নিয়ে ভারত সরকার প্রতিবাদ জানায়, তাদের মনে হয়েছে এই সূচকে ভারতের অবস্থান ঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি। তবে ভারত সরকার নিজে থেকেও এইরকম কোন সুযোগ তৈরি করছে না। শুধু সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই নয়, প্রতিটি রাজ্যে দাসত্ব সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ভারত কিন্তু এই সমস্যা নিয়ে যথেষ্ট সচেতন। মানব পাচার, গোলামী, বাধ্যতামূলক শ্রম, শিশু পতিতাবৃত্তি, জোরপূর্বক বিবাহ, শিশুশ্রম, চুক্তিবদ্ধ শ্রম ইত্যাদি বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করেছে।

ক্রীতদাসত্ব আইন করে বন্ধ করা যায় বা গেছে, কিন্তু দাস মানসিকতা তো আর আইন করে বন্ধ করা যায় না। ক্রীতদাসত্বের মধ্যে একটা অসহায়তার ভাব আছে। নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থার চাপে সে দাসত্ব মানতে হয়, যেমন যুদ্ধ-বন্দী বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকরা এই অবস্থার শিকার। এটা পুরোপুরি শারীরিক অবস্থা। আর দাস মানসিকতা হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। কোন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে বা পরিবেশে এই মানসিক অবস্থা তৈরি হয় যা চিন্তা, ধ্যান ধারণা, অনুভূতি বা আচরণকে প্রভাবিত করে। নিজের ইচ্ছায় বা অজান্তে কোন ব্যক্তি এই মানসিক অবস্থার প্রতি এমন ভাবে আকৃষ্ট হন যে তখন তিনি ভালো-মন্দ বিচার করবার বোধশক্তিও হারিয়ে ফেলে সেই অবস্থার আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হন। তখন আর কুকুর লেজ নাড়ায় না, লেজেই কুকুরকে নাড়ায়। এই যে মানসিকতা তা তৈরী হতে পারে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা, রাজনৈতিক মতবাদ, অর্থনৈতিক চালিকা শক্তি, এমনকি সামাজিক বা পারি পার্শিক ব্যবস্থা থেকে। আর যদি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় ধ্যান ধারণা একটি অপরের পরিপূরক হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় তবে সে তো সোনায় সোহাগা। কাকে ফেলে কাকে রাখি এই অবস্থা।

প্রায়শই রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক মতবাদ ওত প্রোতভাবে জড়িত থাকে। এদের সঙ্গে কখনও কখনও সামাজিক মতবাদও যুক্ত হয়। আর কোনও না কোনও ভাবে যদি ধর্ম এদের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন তা এক অনুশাসনে পরিণত হয় যা কৃষ্ণগহ্বরের মতো সকলকে টেনে নেয়। একবার ঢুকলে বেরোবার আর পথ নেই। তবে কোনও ব্যক্তি এই কৃষ্ণগহ্বরে প্রবেশ করবেন কিনা তা তার স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অবকাশ, পরিবেশ এবং স্বকীয় ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এই যে স্বাধীনতা, তা ক্রীতদাসের নেই। যেমন যুদ্ধ-বন্দী বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক এই অবস্থার শিকার।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে এটা আরও পরিষ্কার হবে। ইসলামিক স্টেট ইদানিং আইসিস বা ইসলামিক স্টেট অফ ইরাক এন্ড সিরিয়া নামেই যার পরিচয় তাদের কথা আমরা খবরের কাগজের দৌলতে জানি। আইসিস একটি ইসলামি খিলাফতের স্বপ্ন রচনা করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অটোমান খালিফার পরাজয়ের পর থেকে মুসলিম বিশ্বে ইসলামের হারানো সুদিন ফিরে পাওয়ার যে আকুতি ফল্গুধারার মত অন্তঃসলিলা ছিল, তাকে উস্কে দিয়েছে। দেশে দেশে মুসলিম যুবকেরা যেভাবে সেই স্বপ্নের টানে ঘর-সংসার ফেলে ইরাক ও সিরিয়ায় পাড়ি দিয়েছে, যে ভাবে তারা আবু বকর আল বাগদাদির ডাকে শহীদ হতে ঝাঁকে ঝাঁকে জেহাদে অংশ নিতে দৌড়েছে, তা সেই স্বপ্নের অমোঘ আকর্ষণকেই প্রতিপন্ন করে। দশম-একাদশ শতাব্দীর ধর্মযুদ্ধের যুগে যা ইসলামকে প্রাণিত, তাড়িত করেছিল। ব্রিটেন সমেত ইউরোপের বিভিন্ন দেশই নয় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষিত-অশিক্ষিতের বেড়া ভেঙে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে আইসিসের মতবাদে আকৃষ্ট হয়ে যেভাবে আইসিসের পতাকা তলে সমবেত হচ্ছে, বিনা প্রতিবাদে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে, এমনকি ক্যামেরার সামনে অবলীলায় মুন্ডচ্ছেদ করছে, তা সম্ভবপর হয়েছে মতাদর্শের বিরাট প্রভাবের জন্যই।

আইসিসের মতন না হলেও আমাদের ভারতবর্ষে গোমাতার নাম করে গোরক্ষকরা যে তাণ্ডব চালাচ্ছে তাও এরকম মানসিকতা থেকেই উদ্ভূত। গোরক্ষকরা নিজে থেকেই এগিয়ে এসে এই মহান দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। তাদের তাণ্ডবের শিকার হতে হয়েছে মুসলমান এবং দলিতদের। কখনও গোরু চোরের অপবাদে,

কখনও গোমাংস রাখার অভিযোগে। বহুক্ষেত্রে তো শুধুমাত্র গুজবের বশেই শেষ করে দেওয়া হয়েছে জীবন। অপরাধ বেড়েই চলেছে। কোথাও গ্রেফতার করা হচ্ছে কয়েকজনকে। কোথাও আইনের ফাঁক গলে পার পেয়ে যাচ্ছে প্রকৃত অপরাধীরা।

অন্য ধর্মে বা জাতে বিবাহ প্রতিহত করার জন্য যে পন্থা নেওয়া হয় তা এই মানসিকতারই প্রতিফলন।
১৯৩০ এর দশকে জার্মানিতে হিটলারের আমলে যে ইহুদী নিধন ঘটেছিল তাও এই মানসিকতার জন্য।

উগ্রপন্থীরা এত দৈহিক, মানসিক, অর্থনৈতিক কষ্ট সহ্য করেও তাদের মতবাদ অনুযায়ী জনসাধারণের ভালো করার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে এও এক ধরনের দাস মানসিকতার পরিচায়ক। রাজনৈতিক মতবাদের দাস। রাশিয়ায় স্টালিনের আমলে যারাই তার মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করত, তাদের যে এই পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হত, সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক মতাদর্শের দাসত্বের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

কর্পোরেট জগতে যারা উচ্চপদে কর্মরত আর শুধু উচ্চ পদেই বা কেন অন্য যে কোন পদেই হোক না কেন, তবে উচ্চপদ যারা আসীন তাদের ক্ষেত্রে তা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। তাদের কাজ আরম্ভ হয় ঘুম ভাঙা থেকে এবং শেষ হয় ঘুমোবার আগে পর্যন্ত। এই যে চাপ তা নিতে না পেরে অনেকে আবার চাকরি ছেড়েও দেন। এই যে কোম্পানির জন্য নিবেদিত প্রাণ তা যে মানসিকতার জন্ম দেয় তাও এক ধরনের দাস মানসিকতা—কোম্পানির দাস। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শঙ্কর তাঁর ''সীমাবদ্ধ'' উপন্যাসে কর্পোরেট জগত সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন।

একটা কথা আমরা প্রায়ই শুনি কর্ম-পাগল অর্থাৎ কাজ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। খালি কাজ আর কাজ। তাতে কোনও ক্লান্তি নেই। এই যে কর্ম পাগলরা, তারাও তো এক ধরনের দাস মানসিকতার শিকার — কাজের দাস।
অনেকে দেখবেন টাকা রোজগার করেই যাচ্ছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। কি করে আরও বেশি আরও বেশি টাকা আয় করা যায়, তাই তার একমাত্র লক্ষ্য, ধ্যান-জ্ঞান। কত আয় করলে সে সন্তুষ্ট হবে তাও সে জানে না। এই যে টাকার পেছনে পড়িমড়ি করে ছোটা, তাওতো এক ধরনের দাসত্বের পরিচয় —টাকার দাসত্ব। পেশাদার ব্যক্তি অর্থাৎ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই মানসিকতা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। আমি অবশ্য যারা উৎকোচের পেছনে ছোটেন তাদের এর মধ্যে আনছি না, কারণ কাজটা হচ্ছে বেআইনী।

আর এক ধরনের দাসত্ব হচ্ছে যন্ত্রের দাসত্ব। আমরা আজ সকলেই প্রায় যন্ত্রের দাসে পরিণত হয়েছি। তা সে দুই চাকার বা চার চাকার গাড়িই হোক, রান্নাঘরের বিভিন্ন গ্যাজেটই হোক বা দৈহিক আরামের বা বিনোদনের যন্ত্রই হোক। রোবট তো অনেকদিন ধরেই কলকারখানায় ব্যবহৃত হচ্ছে। রোবট তো এখন রেস্তোঁরায় খাবার পরিবেশনও করছে।

এখন আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ''কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা''। যখন কোন কম্পিউটারকে মানুষের মস্তিষ্কের মতো করে তৈরি করা হয় অর্থাৎ মানুষের মতো চিন্তা ভাবনা করে কোন কাজকে বুদ্ধি দিয়ে করা যায় তখন সেই কম্পিউটারকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়। অর্থাৎ যখন আমরা কোনো যন্ত্রে এমন কম্পিউটার প্রোগ্রাম সেট করে থাকি যেটা মানুষের মতই কাজ করতে পারে। বর্তমানে আমরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারেও আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হচ্ছি যেমন গুগল ম্যাপ। যেকোনো জায়গায় বসে অন্য কোন জায়গার অবস্থান আমরা মুহূর্তের মধ্যে জেনে যাচ্ছি। গাড়িতে এটা খুবই ব্যবহার করা হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতা আরও সুদূরপ্রসারী। আস্তে আস্তে এমন দিন আসবে যখন আমাদের আর কোন কাজই করতে হবে না। সেদিন আর বেশি দূরে নেই যখন আমাদের ভাবনা চিন্তাও নিয়ন্ত্রিত করা যাবে। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এটা অনেক মানুষের রোজগার কেড়ে নেবে। ফলে ভবিষ্যতে বেকারত্বের সংখ্যা আরো বাড়বে।

সামাজিক মাধ্যমের কল্যাণে বিশ্ব আরও ছোট হচ্ছে। এখানে কম খরচে একসাথে বহুসংখ্যায় বিশ্বব্যাপী মানুষের কাছে নিমেষে বার্তা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক

মাধ্যম নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় হচ্ছে ফেসবুক, ট্যুইটার, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ও ইউটিউব। সামাজিক মাধ্যম মারফত আমরা যে খবর পাই তা কিন্তু কোনও না কোনও ব্যক্তি সংগ্রহ করে সামাজিক মাধ্যম দ্বারা পরিবেশন করছেন। সেই খবর সত্যি নিরপেক্ষ কিনা তাও জানিনা। সামাজিক মাধ্যমে কত যে ভুয়ো খবর বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত করা খবর বেরোচ্ছে, যার পরিণতিতে কত যে প্রাণহানি ঘটছে তার ইয়ত্তা নাই। সামাজিক মাধ্যম যারা বেশি ব্যবহার করেন, বেশি স্বাচ্ছন্দ অনুভব করেন, তারা একাকীত্বে ভোগেন। উদ্বেগ বা বিষাদের শিকার হন এবং আরও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে পারেন।

এদিকে আমরা সকলেই বোধ হয় টেলিভিশন সিরিয়ালের দাস। যে যখন যে সিরিয়াল দেখে তখন তার প্রাণ উসখুস করে সেই সিরিয়ালটা দেখার জন্য। শত কাজ ফেলেও সেই সিরিয়ালটা দেখতেই হবে। তখন যদি কেউ দেখা করতে আসে তবে সে খুবই বিরক্ত হয়, আর যে আসে সেও খুব অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

এছাড়াও আরও অনেক রকম দাস মানসিকতার কথা আমরা জানি, যেমন আমিত্বের দাসত্ব, খ্যাতির দাসত্ব, কুসংস্কারের দাসত্ব, লজ্জার দাসত্ব কিংবা ভালোবাসার দাসত্ব। আর যে দাস মানসিকতার কথা না বললেই নয় এবং যা বলে আমি আজ আমার লেখা শেষ করব তা হচ্ছে ক্ষমতার দাসত্বের মানসিকতা। প্রয়োগকারী ভাবেন ক্ষমতা যখন আছে তখন তা প্রয়োগ করে দেখাতে হবে যে তিনি সেই ক্ষমতার অধিকারী। তা ক্ষুদ্র পরিসরেই হোক বা বৃহত্তর পরিসরে। মজার কথা হচ্ছে যে আমরা সকলেই অল্প বিস্তর এই মানসিকতায় ভুগি, তা যে কোনও পরিসরেই হতে পারে।

এই মানব সমাজে সবারই একটা পরিচয় আছে তা পরিবারেই হোক বা বৃহত্তর সমাজে। এই পরিচয় একটা হচ্ছে জন্মসূত্রে পাওয়া আর অন্যটা হচ্ছে অর্জিত। এই জন্মসূত্রে পাওয়া পরিচয় যদি পরিবার কেন্দ্রিক হয় তবে তা হবে সময় ভিত্তিক, যেমন, আজ যে হচ্ছে ছেলে, কাল তার পরিবারে তার পরিচয় হবে বাবা হিসেবে। আজ যে বৌমা কাল সে হবে শাশুড়ি। পরিবারের সকলেরই একটা ক্ষমতা থাকে। যা সাধারণত বয়সের মাপকাঠিতে প্রাপ্ত হয়। যেমন পিতা পুত্রকে শাসন করবে এটাই ধরে নেওয়া হয়। তবে কখনও কখনও সেই ক্ষমতার প্রয়োগ উৎপীড়নের পর্যায়ে পড়ে যায়, যেমন, বধূ নির্যাতন। আজকাল বধূ নির্যাতনের কথা আমরা প্রায়ই শুনতে পাই এবং সেই নির্যাতনকারী প্রায় সব ক্ষেত্রেই হচ্ছেন আরেক নারী, যিনি হচ্ছেন শাশুড়ি। শাশুড়িরা ভাবেন বউমারা থাকবেন তাদের অধীনে। বেচাল হলেই নেমে আসবে নির্যাতন। আর কন্যাপক্ষ থেকে আরও বেশি পণ আদায়ের জন্য বধূর উপর নির্যাতন হয়। আর যে শাশুড়ি নির্যাতন করছেন তিনি নিজের সুবিধামতো ভুলে যান যে একসময় বধূ হিসেবে তিনিও এই নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। ক্ষমতার কি অপার মহিমা!

হিন্দু সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। সমাজে কে উচ্চ কে নীচ তা নির্ধারিত হয় সে কোন বর্ণে জন্মেছে তার উপর। যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছে সমাজে তার স্থান হয় সবচেয়ে উপরে। আর যে নিম্ন বর্ণে যেমন শূদ্রের ঘরে বা পঞ্চম বর্ণে জন্মেছে তার স্থান সবার নিচে। বলা বাহুল্য উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিরাই সব ক্ষমতা ভোগ করে।

এই নিম্ন-বর্ণ-জাত ব্যক্তিরা সামাজিক আন্দোলন করে তারা যাতে ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করতে পারেন সেই পথ প্রশস্ত করেন সংরক্ষণের মাধ্যমে। বর্তমানে নির্বাচনের মাধ্যমে সেসব পূরণ করা হয়, তা পঞ্চায়েত স্তরেই হোক বা পৌরসভার, বিধানসভায় হোক বা লোকসভায় সর্বত্রই তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য এবং কিছু ক্ষেত্রে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সমস্ত সরকারি, আধা-সরকারি সংস্থায় এবং স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যত শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ হবে তাতে তফসিলি জাতি উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। আর সমস্ত সরকারি এবং সরকার প্রোষিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে তারা পড়বার সুযোগ পায় তার জন্যও সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সংরক্ষণের মাধ্যমে এই যে ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া তার ফলে এইসব তথাকথিত নিম্ন বর্ণের ব্যক্তিদের

হাতেও সরকারি ক্ষমতা এল যা এতদিন উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের করায়ত্ত ছিল। শোনা যায় জগজীবন রাম, যিনি মুচি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি যখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, তখন অনেক ব্রাহ্মণ পদাধিকারী ব্যক্তিরাও তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের যে সুযোগ তা যাতে তারাও পেতে পারেন তার জন্য তথাকথিত উচ্চবর্ণের লোকেরাও নিম্ন বর্ণের তালিকায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে চাইত। সংরক্ষণের মাধ্যমে তথাকথিত নিম্নবর্ণের যে সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন হল তাকে যদি ''ঊর্ধগামী গতিশীলতা'' বলা হয়, তবে উচ্চবর্ণের লোকেদের নিম্ন বর্ণে ঢোকার প্রবণতাকে ''বিপরীত গতিশীলতা'' বলা যেতে পারে। ক্ষমতার ভাগীদার সবাই হতে চায়, তার জন্য ''জাতের বড়াই'' আর কেউ করতে চায় না।

ভারতের মুসলমানরা এক সমজাতীয় গোষ্ঠী নয়। হিন্দুদের মতন মুসলমানদের মধ্যেও বৈষম্য আছে, তবে তা শ্রেণীভিত্তিক, হিন্দুদের মতন জাতভিত্তিক নয়। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই শ্রেণী এবং জাতভিত্তিক বৈষম্যের মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই। মুসলমানরা সামাজিক বিভাগ অনুযায়ী তিনটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত আসরাফ, আজলাফ এবং আরজাল। আসরাফরা হচ্ছে সবার উপরে, সৈয়দ, শেখ, সিদ্দিকি, পাঠান হচ্ছে এই গোষ্ঠীভুক্ত। আজলাফ হচ্ছে সেই শ্রেণীর লোক যারা হাতের কাজে পারদর্শী আর আরজাল হচ্ছে সবচেয়ে নিচে যারা তারা। আজলাফ এবং আরজাল মিলে হচ্ছে পাসখন্দ বা পশ্চাৎপদ শ্রেণী। এই পাসখন্দ মুসলমানদের সঙ্গে আসরাফ মুসলমানদের বিয়ে হয় না এমনকি একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়াও করে না। এর কারণ হচ্ছে যে সমস্ত মুসলমানরা যুদ্ধ জয়ীদের সঙ্গে ভারতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন অর্থাৎ নিজেদের আসরাফ বলে দাবি করেন তাঁরা নিম্ন বর্ণের যে সমস্ত হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন তাদেরকে অর্থাৎ পাসখন্দ মুসলমানদের নিজেদের সমগোত্রীয় বলে মনে করলেন না। তাদের দূরে সরিয়েই রাখলেন। তাই তারা মুসলমান সমাজে প্রান্তদেশেই রয়ে গেল যা, ছিল তাদের ভাগ্যে হিন্দু সমাজে। সমতাবাদী ইসলামেও এইসব ধর্মান্তরিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা তাদের জাতভিত্তিক বৈষম্য থেকে মুক্তি পেলেন না, যেন তাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জাতও চলল নতুন ধর্মে। এই পাসখন্দ মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন চলছে। বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যেই হয় কেন্দ্রীয় তালিকায় নয় রাজ্য তালিকায় পাসখন্দ দের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তার ফলে তারা সংরক্ষণের সুবিধা পাচ্ছেন। এখন যে আমরা মুসলমানদের মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি কর্মচারী এবং অন্যান্য পেশাদারদের দেখতে পাচ্ছি, তার অধিকাংশ এই সংরক্ষণের সুবাদেই হয়েছেন। তা না হলে মুসলমান সমাজ শিক্ষায় এবং পেশাদারিত্বে আরও পশ্চাৎপদ থাকত।

এতক্ষণ যে ক্ষমতায়নের কথা বললাম তা কুক্ষিগত করা যায় হয় জন্মসূত্রে নয়তো জন্মসূত্রে যা পাওয়া গিয়েছে তার সঙ্গে অর্জিতের মিলিত প্রয়াসে।

আর পুরোপুরি অর্জিত ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া যায় রাজনীতির ক্ষেত্রে। এখানে কে কত ক্ষমতার অধিকারী হবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার নিজের দক্ষতার উপর। জন্মসূত্রে পাওয়া ক্ষমতার সঙ্গে অর্জিত ক্ষমতার মিলিত প্রয়াসেও ক্ষমতা লাভ করা যায় তবে তার ব্যাপ্তি পুরোপুরি অর্জিত ক্ষমতার থেকে কম হতে বাধ্য। আর যেহেতু নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতেই সব ক্ষমতা তাই সব রাজনীতিবিদদেরই ক্ষমতার প্রসাদ পাওয়ার বাসনাও তীব্রতর হয়। আর একবার কোন একটি পদে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতা লাভ করতে পারলে সেই ক্ষমতা যা হাতে ধরে রাখা যায় বা আরও বেশী ক্ষমতা পাওয়া যায় তার লড়াই শুরু হয়ে যায়। এ লড়াই হচ্ছে বড় ভীষণ লড়াই। এই হচ্ছে ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই। সর্বক্ষণ লড়তে হয় তা না হলে যে কোন সময় ক্ষমতা হারাতে হতে পারে। আর একবার যদি সেই ক্ষমতা হারিয়ে যায়, তবে সেই ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা প্রায় ক্ষেত্রেই দুষ্কর হয়ে পড়ে। তাই যাতে ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা যায় তার চেষ্টাও অব্যাহত থাকে, যে কোনও মূল্যে সেই ক্ষমতা ধরে রাখতে হবে। এই যে আজকাল রাজনীতিবিদরা আকছার এই দল থেকে অন্য দলে পাড়ি দিচ্ছেন তার আসল কারণ তো ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা। এর সঙ্গে মতাদর্শের কোনও সম্পর্ক নেই।

আগেই আমরা রাশিয়ার স্ট্যালিনের আমলে ক্ষমতা

কুক্ষিগত করে রাখার জন্য তার বিরোধীদের নিষ্ক্রিয় করার কথা উল্লেখ করেছি। শুধু রাশিয়া কেন পৃথিবীর সর্বত্র রাজনৈতিক নেতাদের লড়াই করতে হচ্ছে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য। স্পেনের এক নায়ক ফ্যাকো শাসন করেছিলেন একটানা প্রায় চার দশক। আরেক স্বৈরতন্ত্রী চিলির অগস্তো পিনোশে ক্ষমতা ভোগ করেছেন প্রায় দেড় দশক।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নির্বাচিত হতে পারেননি। তিনি সেই পরাজয় মেনে নিতে পারেননি। কারচুপির অভিযোগ তোলেন। তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন কিনা, তা নিয়েও একসময় সংশয় তৈরি হয়। তাঁর সক্রিয় প্ররোচনায় তাঁর সমর্থকরা দেশের সংসদ ভবন যা ''ক্যাপিটল'' নামে প্রসিদ্ধ, ভাঙচুর করে ২০২১ সালের ৬ই জানুয়ারি। স্পীকারের অফিস তছনছ করে, এমনকি কিছুক্ষণের জন্য সেনেটের দখলও নেয়, তাতে মৃত্যুও হয় পাঁচজনের মত। এই কাজের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। তাঁকে অভিযুক্ত করার জন্য তাঁর নিজের রিপাবলিকান দলের কয়েকজন সাংসদ ভোটও দেন। ট্রাম্প হচ্ছেন প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট যাঁকে সংসদ দুইবার অভিযুক্ত করে।

আর এক রিপাবলিকান মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন লোক লাগিয়েছিলেন ডেমোক্রেটারদের কৌশল গোপনে জেনে নেওয়ার জন্য। ধরা পড়ে পদত্যাগ করতে হয় নিক্সন কে। সত্তর দশকের শুরুতে এই ঘটনা পরিচিত হয় 'ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি' নামে। এইখানে একটা মজার ব্যাখ্যা হল নিক্সন না কি মনে করতেন যে একমাত্র তাঁর মতধারাই মার্কিন সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। সুতরাং ডেমোক্র্যাটদের হারানোর জন্য যে কোনোও পন্থা নেওয়া যায়। মতাদর্শের আধিপত্য রক্ষার লড়াইতে কমিউনিস্ট নেতা স্ট্যালিন এর সঙ্গে ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ নিক্সনের মানসিকতায় কী অদ্ভুত মিল!

ব্রাজিলের দক্ষিণপন্থী প্রেসিডেন্ট বোলসোনা রো ২০২২ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পরাজিত হলেও সেই পরাজয় স্বীকার করেননি এবং তাঁর সমর্থকরা প্রথমে তাঁদের অনেকে লুলা সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সামরিক বাহিনীর সশস্ত্র হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছে। শেষে থ্রি পাওয়ার প্লাজার একাধিক ভবনে তাণ্ডব চালায় সমর্থকরা। সুপ্রিম কোর্ট, সংসদ ভবন এবং প্রেসিডেন্টের অফিস তিন জায়গাতেই বীভৎস ভাঙচুর চলে, আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

ক্ষমতা ধরে রাখার প্রবণতা যে কালক্রমে এমন ভাবে বৃদ্ধি পাবে যেখানে ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যাবে বোধহয় তা বুঝতে পেরেই আজ থেকে ১৪০ বছর আগে সেই ১৮৮৭ সালে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক লর্ড এ্যাকটন তার বন্ধু বিশপ ক্রেগটন কে লেখা এক চিঠিতে তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন, Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely অর্থাৎ ক্ষমতার দুর্নীতির দিকে যাওয়ার এক প্রবণতা আছে আর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তো পুরোপুরি দুর্নীতিগ্রস্ত করেই তোলে।

তবে ক্ষমতা দখলে রাখার প্রবণতার বিপরীতেও কেউ কেউ হাঁটেন, যেমন, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আরডার্ন গত ২০২৩ সালের ১৯ শে জানুয়ারী তাঁর পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন এবং তার উত্তরসূরী শপথ গ্রহণ করেন ২৫ শে জানুয়ারি সকাল সাড়ে এগারোটায়। স্কটল্যান্ডের ফার্স্টমিনিস্টার এবং স্কটিশ ন্যাশনাল পার্টির নেতা নিকোলা ষ্টারজিওন পদত্যাগ করেন ২০২৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী। ক্ষমতার মোহ তাঁদের ধরে রাখতে পারেনি। তাঁরা হচ্ছেন ব্যতিক্রমী চরিত্র। আগেকার দিনে ভারতবর্ষেও রাজা-উজীররা ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে স্বেচ্ছায় দূরে চলে যেতেন বাণপ্রস্থ গ্রহণ করে। চতুরাশ্রম ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। এর তৃতীয় আশ্রম হচ্ছে বাণপ্রস্থ। বর্তমানে বেশিরভাগ ক্ষমতাবানরা তাদের গদি হারাতে চান না। তারা যেন-তেন-প্রকারেণ সেই ক্ষমতা দখলে রাখতে চান। তাই তাদের সবসময় লড়াই করতে হচ্ছে ক্ষমতা দখলে রাখার জন্য। তাদের অবাধ ক্ষমতার জন্য যত ই না তারা আপামর জনসাধারণের ঈর্ষার পাত্র হোন না কেন আসলে তারা কিন্তু ক্ষমতার দাসত্বই করে যাচ্ছেন। সিন্দাবাদ নাবিকের মত ঘাড় থেকে এই বোঝা আর নামাতে পারছেন না বা চাইছেন না।